নদীভাঙ্গনে অস্তিত্ব হারাচ্ছে সুন্দর দ্বীপ ভোলা

মীর মাসরুর জামান

সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু বাস্তাবায়নের অভাবে ভোলার নদীভাঙন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে একদিকে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ভিটে ছাড়া হযেছে মানুষ। ধ্বংস হচ্ছে গাছ-পালা, ফসলিজমিসহ ব্যাপক প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদ। অন্যদিকে, স্থানীয় প্রভাবশালীরা ইস্যুটিকে নিয়মিত সুবিধা লাভের একটি মাধ্যম হিসেবে দেখছেন। আবার বিশেষজ্ঞরা এমনকি স্থানীয় বাসিন্দারাও বলছেন, সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা ও স্থায়ী সমাধানের কথা। ভোলা সদরের ভাঙন কবলিত কয়েকটি এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন করে এবং সংশ্লিষ্টজনদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

সর্বশেষ

বৈশাখ মাস থেকে চলতি মৌসুমের ভাঙন শুরু হয়েছে। বহুদিন ধরেই বৈশাখ থেকে শ্রাবণ এমনকি কার্তিক পর্যন্ত তীব্রভাবে নদী ভাঙে। স্রোত বেশি থাকলে শীতকালেও ভাঙন চলে। ভোলার জেলা প্রশাসন ভবনসমূহ থেকে মেঘনার ভাঙন এলাকা এখন মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। ভাঙনের যে প্রাবল্য, তাতে এগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

পটভূমি

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ভোলায় নিয়মিত নদী ভাঙনের শুরু। সাবেক ভোলা মহকুমার সদর দপ্তর ছিল আজকের দৌলতখান থানায়। মেঘনার ভাঙনের কারণে সে সময় এ-টি বর্তমান ভোলার আওতায় নিয়ে আসা হয়। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ভোলা ছিল নোয়াখালীর অংশ। তখন নোয়াখালীর নদী সংলগ্ন অংশে ভাঙন শুরু হওয়ার পর এ-টি বরিশার জেলার সাথে যুক্ত করা হয়। ভোলার ভাঙন সমস্যা কত পুরনো তা বোঝা যায় একজন প্রবীণ সাংবাদিকের মন্তব্য থেকে। তিনি বললেন, ১৯৬৫ সাল থেকে লিখছি। লেখার প্রথম বিষয় ছিল নদীভাঙন। এখনও এই বিষয়েই লিখছি। হয়তো শেষ বিষয়টিও হবে নদীভাঙন।

৭০ এর বন্যার পর থেকে ভোলায় নদী ভাঙন নিয়মিত রূপ পেয়ে যায়।

ভাঙনচিত্র

মেঘনা ও তেঁতুলিয়া, এই দুই নদীর ভাঙনই গ্রাস করছে ভোলাকে। ভাঙনের ফলে এ পর্যন্ত ভোলা জেলার যে চিত্র দাঁড়িয়েছে, তা এখানে তুলে ধরা হলো।

মেঘনা : মেঘনার ভাঙনের ফলেই সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ভোলা সদরসহ আশ-পাশের অঞ্চলসমুহ

ভোলা সদর : ভোলা সদর থানার ধনিয়া কান্দিয়া, ইলিশা ইউনিয়নের নদী সংলগ্ন এলাকা ভাঙনের শিকার। এইসব এলাকার বেশ ক'টি গ্রাম ইতোমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

দৌলতখান থানা : এই থানার সৈয়দপুর, ভবানীপুর, মেদুয়া, চরপাতা ইউনিয়ন ভাঙছে। ইতোপুর্বে মদনপুর বলে একটি ইউনিয়ন ছিল। ভাঙনের কারণে এ-টি এখন আর নেই। সরকার বাতিল ঘোষণা করে দিয়েছে দশ বছর আগে। হাজীপুর নামে একটি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩টি ওয়ার্ড নিশ্চিহ্ন। বর্তমানে নতুন একটি চরসহ এই ইউনিয়নের এলাকা হিসেব করা হয়।

বোরহান উদ্দিন থানা : এই থানার হাসান গর ইউনিয়ন ভাঙছে। এই ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী মির্জাকালু বাজার এখন আর নেই। এ-টি ভোলা জেলার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বত্বপুর্ণ ছিল। এখানে দুটো বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল। ব্যাংকগুলোও উঠে গেছে।

তজুমুদ্দিন থানা : তজুমুদ্দিন থানার চাঁদপুর ইউনিয়ন সোনাপুর ইউনিয়নের সমগ্র এলাকা এবং মলংচড়া ইউনিয়নের কিছু অংশ নিয়মিত ভাঙনের শিকার হচ্ছে।

লালমোহন থানা : এই থানার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন ভাঙছে। এই ইউনিয়নের বিপুল সংখ্যক মানুষ ভিটা-ছাড়া হয়ে অন্যত্র পাড়ি জমিয়েছে।

মনপুরা : মনপুরার সাকুচিয়া ইউনিয়নের নদী সংলগ্ন এলাকা নিয়মিত ভাঙছে।

তেঁতুলিয়া নদী : ভোলাসদরের দিঘলদী এবং বোরহান উদ্দিন থানার গঙ্গাপুর ইউনিয়ন তেতুলিয়ার ভাঙনের শিকার।

ফলাফল

অব্যাহত নদী ভাঙনের ফলে কয়েক লক্ষ একর জমি এ পর্যন্ত ভেঙেছে। কয়েক লক্ষ পরিবার ভিটে ছাড়া হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বেশ কিছু এলাকা যেমন- মধুপুর, নিয়ামতপুর, গাজীপুর, খড়কি তাঁতপল্লি, দৌলতখান থানার কালা রায়ের মাঠ এসব নিশ্চিহ্ন হয়েছে। একসময় এসব এলাকা তাঁতশিল্পের জন্যে বিখ্যাত ছিল। এখানকার তাঁতজাত পণ্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান হতো। তার কিছুই আজ আর নেই।

বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিলীন হয়ে যাওয়ায় এবং বারবার ভাঙনের শিকার হওয়ার ফলে ভোলার মানুষ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পিছিয়ে আছে। ফসলি জমি এবং ভিটে-মাটি ভাঙনের ফলে এলাকায় ভূমিহীনের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। স্থানীয় একটি পত্রিকার সম্পাদক বললেন, ভোলা শহরে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষই নদীভাঙনের শিকার। ভাঙনের ফলে কৃষক, তাঁতিসহ অনেকে হারিয়েছেন তাদের পুরনো পেশা। বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছেন নিম্নতর পেশা। শিকার হয়েছেন কঠোর দারিদ্র্যের।

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে যে সমস্ত রাস্তা তৈরি করেছে, তাও কিছু জায়গায় হুমকির মুখে। এলাকাবাসীরা বলেন, ১০ কোটি টাকা ব্যয় করে ভাঙন রোধের কাজও হতে পারতো। ভেঙে গেলে এসব রাস্তার কিছুই থাকবে না। রাস্তাগুলো প্রায় আধাকিলোমিটার বা তারও কম জায়গার মধ্যে ভাঙন চলে এসেছে। ভাঙনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশও বিপর্যস্ত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে নারিকেল, সুপারিসহ প্রচুর গাছপালা।

সরেজমিন পরিদর্শনে জানা যায়, নদীভাঙনই ভোলার প্রধান সমস্যা। এখনকার প্রায় সব সমস্যার মূলেই কারণ হিসেবে রয়েছে নদীভাঙন। ভাঙনের ফলে এখানে কোনো শিল্প গড়ে উঠছে না। ঝুঁকির কারণে পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজি খাটাচ্ছেন না।

ভাঙনের মানুষ

ধনিয়া, কাচিয়া ইউনিয়নে যে-দিন সরেজমিন পরিদর্শনে যাওয়া হয় তার আগের রাতেও ভেঙেছে এই এলাকাগুলোর বিস্তীর্ণ নদী তীর।

ভেঙে যাওয়া পাড়ে ধসে পড়া গাছপালা আর ঘরবাড়িতে ভগ্নাবশেষ তুলে নিতে এসেছে অনেক নারী-পুরুষ-শিশু। আরেক পাশে ভাঙন রোধ করার জন্যে পোল্ডার বানানো চলছে। সেখানেও জড়ো হয়েছে অনেক মানুষ। এদের মধ্যেই ছিলেন, আব্দুল মুনাফ (৪১) এবং হানিফ ব্যাপারী (৬০)। আব্দুল মুনাফ বললেন, গত এক সপ্তাহের মধ্যেই ৫০টি পরিবারের টিনের ঘর এবং অগণিত শনের ঘর ভেঙে গেছে। এ পর্যন্ত ধনিয়া ইউনিয়নের প্রায় ১০০০ পরিবার ভিটে-বাড়ি হারিয়েছে।

ষাট বছর বয়সী হানিফ ব্যাপারী দাঁড়িয়ে ছিলেন তার আপাতত বেঁচে যাওয়া ছোট কুঁড়েঘরের সামনে। ভাঙন আর কয়েক গজ এগুলে তার এই ভিটেটিও যাবে। তিনি জানালেন, এ পর্যন্ত তিনি ২২ বার ভাঙনের শিকার হয়েছেন। চরটবগীর মধুপুরে তাঁর প্রথম বাড়ি এবং ফসলি জমি ছিল। এখন এ মধুপুর এলাকাটিই আর নেই। গোটাটাই চলে গেছে নদীগর্ভে। তারপর ঘর তোলেন নিয়ামতপুরে। তাও ভাঙে। এবং এভাবে মোট ২২ বার বাড়ি-ভিটে ছাড়তে হয়েছে তাকে। ধনিয়ার এই কুঁড়েঘরটি তার ২৩তম আশ্রয়। এবং এটিও হয়তো এই মুহূর্তে আর নেই।

ভাঙনরোধে এ যাবত যা হয়েছে

ভাঙন কবলিত এলাকায় পাইনোকোপার (বাঁশ দিয়ে বক্সের মতো বানিয়ে ভেতরে খোয়া, বালি, সিমেন্টের ছাঁচ) ফেলা হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড এ কাজ করেছে। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী যে হিসেব দেখানো হয়েছে বাস্তাবে তার এক তৃতীয়াংশ ফেলা হয়েছে। (কাগজপত্রে এক লাখের হিসেব দেখানো হয়েছে, ফেলা হয়েছে ৫০ হাজার)।

বর্তমানে আর-সি ব্লক তৈরি করে ভাঙন কবলিত স্থানে স্থাপন করা হচ্ছে। এখানেও ব্লকের গুণগত মান নিয়ে অভিযোগ আছে, মান যাচাই করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সব সময় থাকেন না। সরেজমিন তাদের দেখা পাওয়া যায়নি। নির্মাণ কাজের আশ-পাশে উপস্থিত কয়েকজন গ্রামবাসী বললেন- যে পরিমাণ ব্লক তৈরির কথা ছিল, তার চেয়ে কম তৈরি করা হচ্ছে (এক হাজারের জায়গায় ৭০০)।

ধনিয়া ইউনিয়নের একজন মুদি দোকানদার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ভালো করে কাজ করলেতো কিছুদিন পর পর ঠিকাদারি পাওয়া যাবে না। তাই ইচ্ছে করেই ঠিকাদাররা দায়সারা গোছের কাজ করেন। অন্যদিকে, ভাঙনের ফলে যাতে জমিতে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করতে না পারে সে জন্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড ভাঙন এলাকায় বাঁধ তৈরি করেছে।

যাদের অর্থায়ন

এডি বি, বাংলাদেশ সরকার, ডাচ সরকার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ভাঙন রোধে এ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় করেছে এবং এখনো করছে।

বিশ্লেষণ

ভোলার নদীভাঙন সমস্যাটি দীর্ঘদিনের পুরনো সমস্যা হলেও এটি সমাধানের কোনো সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা আজো নেয়া হয়নি। ভাঙন প্রতিরোধে এখন পর্যন্ত যে প্রকল্পগুলো নেয়া হয়েছে, সব আমলেই তা বাস্তাবায়নের দায়িত্ব পেয়েছে ক্ষমতাসীনদের আশির্বাদপুষ্ট লোকজন। সমস্যা সমাধানের চাইতে তারা নিজেদের মুনাফার দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্যে কাজ বাস্তাবায়নে ফাঁকি দেয়া হয়েছে। আবার স্থায়ী সমাধানের চাইতে বরং আপাত সমাধানের মাধ্যমে সমস্যাটিকে টিকিয়ে রেখে দীর্ঘদিন ধরে কাজ চলিয়ে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। ভোলা সদর থানার ধনিয়া, কাচিয়া ইউনিয়নের ভাঙন কবলিত এলাকার বাসিন্দা ও স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলে এসব জানা গেছে।

ধনিয়া ইউনিয়নের গ্রামবাসী আব্দুল মুনাফ বলেন, পুর্বদিক থেকে জোয়ারের পানি এসে ধনিয়া, কাচিয়া এলাকায় আঘাত করে। ফলে পুর্বদিকের জোয়ারের পানি আটকানোর ব্যবস্থা না করে, ধনিয়া, কাচিয়ায় বোল্ডার ফেলে ভাঙন প্রতিরোধ করা যাবে না। সরেজমিন, বোল্ডারসহ নদীর পাড় ভেঙে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তাছাড়া বোল্ডারগুলোও পর্যাপ্ত সিমেন্ট দিয়ে বানানো হচ্ছে না, ফলে ভেঙে যায় বলে আঃ মুনাফ অভিযোগ করেন। স্থানীয় একজন সাংবাদিক বলেন, ভোলার ভাঙন সমস্যাটি এখন স্থানীয় রাজনৈতিক ইস্যুর রূপ নিয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা তাদের স্বার্থে ইস্যুটি ব্যবহার করছেন মাত্র। স্থায়ী সমাধানের মনোভাব কারো মধ্যে দেখা যায় না।

সুপারিশ: সমস্যা বনাম সম্ভাবনা

ভোলা এমন একটি জেলা, যার মাটি এত উর্বর যে, এখানে নিজেদের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো যায়। ভোলার শাহবাজপুর (১০ নম্বর ব্লক) দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র। বাপেক্স এর হিসেব

অনুযায়ী এখানে দশ ট্রিলিয়ন ঘণফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে। কারো কারো মতে এই পরিমাণ আরো বেশি হতে পারে। ভোলার সর্ব দক্ষিণের চর ফ্যাশনের চর কুকড়ি-মুকড়ি, চর ফকিরা এলাকায় চিংড়ি ঘের গড়ে উঠেছে।

ভোলায় বিশাল ডেইরি ফার্ম করার সম্ভাবনাও রয়েছে। বন বিভাগ (চর ফ্যাশনে) ব্যাপক বন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নদীভাঙন এই সমরাস্তা কিছুর জন্যেই প্রচণ্ড হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে দেশের স্বার্থেই ভোলাকে রক্ষা করা এখন প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠেছে। প্রতিবেদনের জন্যে তথ্য সংগ্রহকালে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই সকল তথ্য ও মতামত প্রকাশ করেন।

সম্ভাব্য সমাধান

পানি বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত ভাঙন এলাকা পর্যবেক্ষণ করে বলেন- স্রোত বেশি হলে ভাঙনের তীব্রতা বাড়ে। ফলে, নদীর গতিপথের ওপর গবেষণা করে দ্রুত সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাধান করতে হবে। প্রয়োজনে দেশি গবেষকের সাথে বিদেশি গবেষকদের অন্তর্ভুক্ত করে কাজ করতে হবে। গত পঞ্চাশ বছরের উপাত্তের বিশ্লেষণ করতে হবে। তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ দিয়ে সমাধান হচ্ছে না।

সরেজমিন পরিদর্শনকালে স্থানীয় সমাজকর্মীদের অনেকেই বলেছেন, ভোলায় নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের শাখা স্থাপন করা উচিত। তাহলে এখান থেকে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের পথ বের করা যাবে। স্থানীয় সাংবাদিকদের অনেকে বলেছেন, অতীতে ভাঙন প্রতিরোধে যে প্রকল্পগুলো নেয়া হয়েছে সেগুলোর জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তাবায়নে সমস্যা হয়েছে। তাই, প্রকল্প প্রণয়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অর্থেরও নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন।

সহযোগিতা : আহাদ চৌধুরী তুহিন, সাংবাদিক, ভোলা

সৌজন্যে ঃ ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)

নদীভাঙ্গন ও নাব্যতাহ্রাস
পিরোজপুর

রিয়াজ উদ্দিন খান

কঁচা, কালীগঙ্গা, সন্ধ্যা, বলেশ্বরের অব্যাহত ভাঙ্গনে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে পিরোজপুরের মানচিত্র। গত দশ বছরের ভাঙ্গনে বিলীন হয়েছে অন্তত দশটি গ্রাম। নিশ্চিহ্ন হয়েছে দুইটি নদীবন্দর এবং হুমকির মুখে পড়ে আছে দশটি বন্দর। অন্যদিকে স্থানে স্থানে নদীর বুকে চর জেগে ওঠার ফলে নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে নৌযোগাযোগ নির্ভর জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় সৃষ্টি হচ্ছে মারাত্মক সংকট। বর্তমান ধারায় ভাঙ্গন অব্যাহত থাকলে আগামী বিশ বছরে বিলীন হবে আরও বেশ কয়েকটি গ্রাম, গুরুত্বপুর্ণ বন্দর ও স্থাপনা। জেলার ভাঙ্গন কবলিত বিভিন্ন অঞ্চল এবং বন্দরসমুহ সরেজমিন পরিদর্শন করে এবং সংশ্লিষ্ট লোকজনের সংগে কথা বলে পিরোজপুর জেলার নদনদীর এই চিত্রটি পাওয়া যায়।

পিরোজপুর জেলাকে ঘিরে প্রবাহিত হচ্ছে বলেশ্বর, কঁচা, কালীগঙ্গা, সন্ধ্যা ও মধুমতি। এসব নদীর তীরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য জনপদ। অনেকগুলো ছোট বড় নদীবন্দর। প্রতিটি বন্দর আজ ভাঙ্গন কবলিত। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে কোনটা নিশ্চিহ্ন প্রায়। আর কোনটা ক্রমাগত সরে যাচ্ছে পিছনের দিকে। মানুষের বসতভিটার কাছে। ১০ বছর আগে ছিল এমন অনেক গ্রাম আজ নিশ্চিহ্ন। প্রতিবছর ভাঙ্গনের শিকার হয়ে জমিজমা বসতভিটা হারিয়ে উদ্বাস্তু হচ্ছে অনেক মানুষ। সমগ্র জেলা জুড়েই চলছে ভাঙ্গনের এক নীরব প্রক্রিয়া।

অন্যদিকে জেলার নদীগুলিতে বিভিন্ন জায়গায় জেগে উঠেছে চর। ফলে নদীর নাব্যতাহ্রাস পাচ্ছে, নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে। এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। সংকটাপন্ন হচেছ মানুষের জীবন ও জীবিকা। অথচ ভাঙ্গন রোধ কিংবা নাব্যতা বৃদ্ধি কোন ক্ষেত্রেই কোন বন্দোবস্ত নেয়া হচ্ছেনা। জেলার নদীভাঙ্গন, নদীর নাব্যতাহ্রাসের চিত্র এবং এর ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো একে একে তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

ভাঙ্গনের সামগ্রিক চিত্র

পিরোজপুরের নদীভাঙ্গন শুধুমাত্র তার ১০টি বন্দরকে ঘিরেই আবর্তিত নয়। ভাঙ্গন চলছে নদীর সমগ্র তট রেখা জুড়ে। প্রায় সমগ্র জেলা নৌপথে ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ করা হয় জেলার নদী ভাঙ্গনের চিত্র। কয়েকটি বন্দরে নেমে ভাঙ্গন বিষয়ে কথা হয় বন্দরের মানুষের সাথে। নৌপথ ধরে ঘুরে দেখা হয় সদর, কাউখালী ভান্ডারিয়া, স্বরূপকাঠি আবার হুলারহাট থেকে স্টীমারে করে বরিশাল। যেখানেই চোখ পড়েছে সেখানেই ভাঙ্গনের চিহ্ন। নদীর স্রোতে, ঢেউ এ অল্প অল্প করে ভেঙ্গে পড়ছে পাড়ের জমি। কোথাও বা ফসলের ক্ষেত, কোথাও কোথাও বনজ বৃক্ষ, কোথায় বা ভাঙ্গনের অপেক্ষায় আছে গবীর মানুষের বসত ভিটা।

ভাঙ্গন পরিস্থিতি (বন্দর ভিত্তিক)

হুলারহাট

হুলারহাটকে বলা হয় পিরোজপুর শহরের প্রবেশদ্বার। শহর থেকে ৭ কি: মি: দুরে কালীগঙ্গা নদীর তীরে হুলারহাট বন্দর। হুলারহাট বন্দরে রয়েছে লঞ্চঘাট, স্টীমারঘাটসহ অনেক গুরুত্বপুর্ণ স্থাপনা। অনেক দোকান পাট নিয়ে একটি ব্যস্ত নদীবন্দর। বর্তমানে এই বন্দর তীব্র ভাঙ্গনের মুখে। প্রতিবছর নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে বন্দরের দোকানপাট, ঘর-বাড়ি। একটু একটু করে ক্রমাগত পিছিয়ে আসছে লঞ্চঘাট, স্টীমারঘাট। হুলারহাট বন্দর থেকে বেকুটিয়া ফেরী ঘাট পর্যন্ত প্রায় ১ কি: মি: নদী ভাঙ্গছে। ইতিমধ্যে একটি ইউনিয়নের বেশির ভাগই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বন্দরের কিছু দোকান পাট টিকে আছে জলের উপর খুটিতে ভর করে। আসন্ন বর্ষা মৌসুমের সম্ভাব্য ভাঙ্গনের মুখে আর কয়টি দোকান, কয়টি বাড়ী অথবা কত একর জমি নদীর পানিতে তালিয়ে যাবে তার সংখ্যা অথবা অংক নির্ধারণ করা না গেলেও সংশ্লিষ্ট মানুষের হতাশা, আশংকা আর আতংকের ছবিটি পরিষ্কার। বিগত বিশ বছরের অব্যাহত ভাঙ্গনে হুলারহাট ১ কি: মি: পেছনে সরে এসেছে।

কাউখালী

পিরোজপুর জেলার ৬টি থানার মধ্যে একটি অন্যতম বাণিজ্যিক গুরুত্বপুর্ণ থানা কাউখালী। সন্ধ্যা ও কঁচা নদীর মোহনায় কাউখালী বন্দর। কাউখালী বন্দর আজ তীব্র ভাঙ্গনের মুখে বিপন্ন। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে চলছে কাউখালীর ভাঙ্গন। ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়েছে বন্দরের অনেক দোকান পাট। বন্দরের আশেপাশের বাড়ী ঘর। কাউখালী লঞ্চঘাটটি প্রতিবছর ভাঙ্গছে এবং প্রতিবছর পিছিয়ে যাচ্ছে। বন্দরের পাশেই কাউখালী সরকারি খাদ্যগুদাম। বিশাল খাদ্যগুদামের সীমানা দেয়ালের ভেতরেও কোথাও কোথাও পৌছে গেছে ভাঙ্গনের চিহ্ন। যে কোন মুহুর্তে সীমানা দেয়ালটি ধ্বসে পড়তে পারে। খাদ্য গুদাম ছাড়া ও সরাসরি ভাঙ্গনের মুখে আছে অনেক মানুষের ঘর বাড়ী, দোকান পাট, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

তেলীখালী বন্দর

ভান্ডারিয়া থানার একটি গুরুত্বপুর্ণ বন্দর তেলীখালী। বলেশ্বর নদীর পাড়ে এ বন্দরের অবস্থান। কিন্তু তেলীখালী বন্দর আজ বলেশ্বরের ভাঙ্গনের করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন। এ বন্দরের দোকান পাট এবং কয়েকশ বাড়ী-ঘর বিলীন হয়ে গেছে। বন্দর সংলগ্ন তেলীখালী গ্রাম যা একসময় কোথায় ছিল এখন আর তা জানা যায় না। পিরোজপুর জেলার অনেকগুলি নদী বন্দরের মধ্যে তেলীখালীর অবস্থা সবচেয়ে করুণ। অব্যাহত ভাঙ্গনে বন্দর এখন চলে গেছে দু'কিলোমিটার ভেতরে। নদী সংলগ্ন বাড়ী-ঘর হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে অনেক মানুষ। বর্তমানে ভাঙ্গনের মুখে রয়েছে আরও শতাধিক পরিবার।

চরখালী-টগরা

পিরোজপুর ভান্ডারিয়া সড়কের ঠিক মাঝখানে চরখালী বন্দর ও ফেরীঘাট। চরখালী অবস্থিত কঁচা নদীর পাড়ে। চরখালীর দুই পাড়ই ক্রমাগত ভাঙ্গছে। পুর্ব পাড়ে কিছু কিছু জায়গা ভাঙ্গছে আবার কোথাও কোথাও চরও

জেগেছে। কিন্তু পশ্চিম পাড়ে শুধুই ভাঙ্গন। ভাঙ্গছে ঘর-বাড়ি দালান কোঠা, ফসলী জমি। তাজা বনজ ও ফলজ বৃক্ষ একে একে শেকড় শুদ্ধ লুটিয়ে পড়ছে কঁচা নদীর ঘোলা পানিতে। ফেরী ঘাট থেকে যতদুর দুই পাশে চোখ যায় চোখে পড়ে ক্রমাগত ভাঙ্গনের চিহ্ন।

তুষখালী

মঠবাড়িয়া থানার অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র ও বন্দর তুষখালী। একটি বিশাল এলাকার জনগণের ব্যবসা বাণিজ্য যাতায়াতের একমাত্র পথ তুষখালী বন্দর। কিন্তু তুষখালী বন্দর ভাঙ্গনের মুখে। ভাঙ্গন কবলিত বন্দরের দোকান পাট ক্রমাগত পেছনের দিকে সরে আসছে।

রাজবাড়ী-জলাবাড়ী-ইন্দেরহাট

পিরোজপুর জেলার অর্থনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপুর্ণ থানা স্বরূপকাঠি। সুন্দরবনের কাঠ ব্যবসার ৯০ ভাগ নিয়ন্ত্রিত হয় স্বরূপকাঠিতে। পিরোজপুর সদর থেকে লঞ্চে ৩ ঘন্টার পথ স্বরূপকাঠি। কাউখালী থেকে সন্ধ্যা নদী ধরে এগিয়ে গেলে স্বরূপকাঠি- এরই মধ্যে পড়ে তিনটি গুরুত্বপুর্ণ বন্দর রাজাবাড়ি, জলাবাড়ি, ইন্দেরহাট। নদীর দুই পাশেই যতদুর যাওয়া যায় ততদুর ভাঙ্গনের চিহ্ন। বহুকষ্টে রাজবাড়ি স্টিমারঘাটটি টিকিয়ে রাখা হয়েছে ভাঙ্গনের মুখে। নদীর ভাঙ্গা পাড় থেকে জেটিতে যেতে হয় একটি অপ্রশস্ত কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে। ঝুকিপুর্ণ এই জায়গাটিতে যে কোন মুহুর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। জালাবাড়ীতে এখন কোন লঞ্চঘাট নেই। নদীর মাটির পাড়েই ঘেঁষে দাঁড়ায় লঞ্চ, স্টীমার। লঞ্চ ভেরার জায়গাটিতে দীর্ঘ এলাকা জুড়ে চলছে ভাঙ্গন। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগিয়ে চলেছে স্বরূপকাঠির দিকে। ইন্দেরহাট বন্দর, যেখানে এসে ভীড়ে সুন্দর বনের কাঠ বোঝাই নৌকো, সেখানে চলছে প্রবল ভাঙ্গন। ভাঙ্গনে ইতিমধ্যে তলিয়ে গেছে ৫০টি স-মিল। এক কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পড়ছে ইন্দেরহাট বন্দর।

মাটিভাঙ্গা- শ্রীরামকাঠি

গোপালগঞ্জ থেকে মধুমতি নদী পিরোজপুর জেলায় প্রবেশ করেছে নাজিরপুর থানার ভেতর দিয়ে। নাজিরপুর থানার দুটি গুরুত্বপুর্ণ বন্দর মাটিভাঙ্গা এবং স্বরূপকাঠি থানায় শ্রীরামকাঠি। মধুমতির ভাঙ্গনে বিপন্ন, বিপর্যস্ত এই দুটি বন্দর। বন্দরের কয়েকশ বাড়ী-ঘর এখন নদীর গর্ভে অতীত।

পাড়েরহাট

বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করলে পিরোজপুরের সবচাইতে গুরুত্বপুর্ণ বন্দর পাড়েরহাট। দেশের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ একটি মৎস্য বন্দর। সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্য ব্যবসার ৯০ ভাগই নিয়ন্ত্রিত হয় পাড়েরহাট থেকে। এই মৎস্য ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে বন্দর, বাজার, বরফ মিল, লবণ মিল, নৌকা ট্রলার মেরামত

কারখানা। গড়ে উঠেছে জেলে পল্লী । একদিকে ভাঙ্গন অন্যদিকে জেগে উঠা চর বিপন্ন করে তুলেছে বন্দরের বাণিজ্য এবং বন্দরের মানুষের জীবন। ভাঙ্গছে দোকান পাট, বাড়ি-ঘর জেলে পল্লী।

ইন্দুরকানি

পিরোজপুর সদর থানায় ইন্দুরকানি বন্দর। পাড়েরহাট বন্দরের অপর পাড়ে ইন্দুরকানী। ইন্দুরকানী দ্বীপের মতো একটি জায়গা। গোল করে ১০ কি: মি: জুড়ে এটি ভাঙ্গছে। ৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই জায়গাটি ক্রমাগত ভাঙ্গনের ফলে ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে।

ভাঙ্গন জনপদের এলাকার মানুষের কথা

পিরোজপুর শহরে জনসংখ্যার তুলনায় রিক্সাচালকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি।। তার প্রধান কারণ নদীভাঙ্গন। নদীভাঙ্গনে ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে মানুষগুলো হয় ভিক্ষার থালা নেয় অথবা আশ্রয় নেয় রিক্সার প্যাডেলে। কেউ কেউ ছিন্নমুল হয়ে হারিয়ে যায় বড় কোন শহরে বাঁচার সন্ধানে।

হুলারহাট বন্দর থেকে শহরের দিকে যেতে যেতে কথা হয় রিক্সাচালক মতি মিয়ার সাথে। হুলারহাট বন্দরের কাছেই একটি গ্রামে ছিল তার বাড়ি। বয়স ৩০ বছর। তার শৈশবে তার পিতা ছিল মোটামুটি সম্স্নন্ন একজন মানুষ। কালীগঙ্গা গ্রাস করে নেয় তাদের বাড়ি-ঘর, জমি-জমা। ছেলে বেলায় স্বপ্ন ছিল পড়ালেখা করবে। পিতার শখ ছিল ছেলে জজ ব্যারিষ্টার হবে। কালীগঙ্গা সব কিছুর সাথে তাদের স্বপ্নগুলি গ্রাস করে নিয়েছে।

কথা হয় বিভিন্ন বন্দরের দোকানীদের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের মনে আসন্ন শেকড় হারানোর শংকা। তাদের প্রত্যেকের মিনতি যেন ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা করা হয়।

ভাঙ্গন জনপদের বিপন্ন জীবন জীবিকা

নদীভাঙ্গনের যারা সরাসরি শিকার তারা এক পর্যায়ে সহায় সম্বলহীন নিঃস্ব হয়ে যায়। তাদের পেশায় পরিবর্তন তখন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। হয় তারা দিনমজুরে রূপান্তরিত হয় নতুবা হাতে ভিক্ষার থালা নিতে বাধ্য হয়। গ্রামে-গঞ্জে অনেক ধরনের কুটির শিল্প গড়ে উঠে নদীকে কেন্দ্র করে। নদীভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এসকল শিল্প উদ্যোগ। তাছাড়া গঞ্জ, বন্দরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নদীভাঙ্গনের ফলে দোকান পাট হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ধীরে ধীরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি বন্দর নষ্ট হয়ে গেলে সেখানকার মানুষজন জীবন ধারনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সংকটে ভোগে। অনেক সময় সামান্য তেল নুন কেনার জন্য পাড়ি দিতে হয় দুরের পথ। এভাবেই ভাঙ্গন একটি এলাকার কৃষি বাণিজ্য ব্যবস্থাকে বিকল করে দিয়ে বিপন্ন করে তোলে গ্রামীণ জীবন।

ভাঙ্গন রোধে এযাবৎ কালে গৃহীত ব্যবস্থা

পিরোজপুর শহরকে ঘিরে প্রবাহিত হচ্ছে কালীগঙ্গা, কঁচা, সন্ধ্যা, বলেশ্বর। তন্মধ্যে কঁচা এবং সন্ধ্যায় ভাঙ্গনের তীব্রতা বেশি। কিন্তু এযাবৎ নদী ভাঙ্গন রোধে এ জেলায় কোন উল্লেখ্যযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৮৪ সালে হুলারহাট বন্দর রক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। পারকোপাইন পদ্ধতিতে ভাঙ্গন রোধের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এই পদ্ধতি একদিকে যেমন কার্যকরী ছিলনা অন্যদিকে এক পর্যায়ে প্রকল্পটিও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে ভান্ডারিয়া থানাধীন কোনা নদীতে পাড় সংরক্ষণের কাজ করা হচ্ছে। বন্দর রক্ষার জন্য নদীর পাড়ে বোল্ডার ফেলা হচ্ছে। এছাড়া অন্য কোন জায়গা কিংবা বন্দরে ভাঙ্গন রোধে ব্যবস্থা দেখা যায়নি।

নদীর নাব্যতাহ্রাস ও যোগাযোগ সংকট

পিরোজপুর একটি নদী পরিবেষ্টিত জেলা। এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে নদীর ভুমিকা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। নদীগুলিতে মাঝে মাঝেই দেখা যায় বিশাল বিস্তৃত চর। ক্রমাগত জেগে উঠা এই সব চরের কারণে বদলে যাচ্ছে নদীর গতি প্রকৃতি, গতি পথ। ফলে তৈরি হচ্ছে যোগাযোগ সংকট এবং একই সংগে সামাজিক সংকট।

এই সব চরের কারণে কোথাও কোথাও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে গুরুত্বপুর্ণ বন্দর। বন্দরে ঢোকার চ্যানেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মারাত্বকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বাণিজ্যিক কার্যক্রম। ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে অনেক মানুষ।

পিরোজপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কঁচা, বলেশ্বর, কালীগঙ্গা, সন্ধ্যা, মধুমতি নদীতে বিভিন্ন জায়গায় চর পড়াতে এলাকার মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র উপায় লঞ্চ ও স্টিমার চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

জেলার ৬টি উপজেলার মধ্যে নাজিরপুর ছাড়া বাকিগুলোতে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নদীপথ। এছাড়া জেলা সদরের সঙ্গে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনার যোগাযোগের অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম নদীপথ। অধিকাংশ নদীতে বালি পড়ে চর সৃষ্টি হওয়ায় নৌযান, বিশেষ করে বড় বড় নৌযানগুলি চলাচল ব্যহত হচ্ছে।

চর দখল ও সামাজিক সংকট
চর চিথালিয়া

নদীর একদিকে ভাঙ্গে অন্যদিকে পড়ে চর। ভাঙ্গনের মুখে পড়ে নিঃস্ব, সর্বসান্ত হয় এক একটি পরিবার। কিন্তু জেগে উঠা চরের ভাগ তারা আর পায়না। চরগুলির মালিক হয়ে পরে স্থানীয় ক্ষমতাশীল লোকজন। এমনকি কখনো কখনো বন্দোবস্ত পাওয়া জমি ও ভোগ দখল করতে পারেনা একজন ভুমিহীন দরিদ্র মানুষ। যেমনটি ঘটেছে পাড়েরর হাটের কাছে জেড়ে উঠা চরে। ৭ নং শংকর পাশা ইউনিয়নে বাজরা চিতলিয়া ভুমিহীন সমিতির মাধ্যমে চর চিথালিয়ার ১৫৭ একর জমি ২২২ জন ভুমিহীনের মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়া হয়। চাষাবাদও করা হয় দুবছর। বর্তমানে এই জমি আর ভুমিহীনদের দখলে নেই। ক্ষমতাসীন সরকারের জনৈক রাজনীতিবিদের নেতৃত্বে

ভুমিহীনদের তাড়িয়ে দেয়া হয় চর থেকে। চরের জমি দিন দিন বাড়ছে। বর্ধিত জমিতে আজ অন্য কেউ হাত দিতে পারেনা। ফলশ্রুতিতে মাঝে মধ্যে তৈরি হচ্ছে সংঘাত।

নদীর নাব্যতাহ্রাস - সমস্যাপুর্ণ জায়গাসমুহ

পাড়েরহাট

পিরোজপুর জেলার একটি অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল শহর থেকে ১০ কি: মি: দুরে কঁচা নদীর তীরে পাড়েরহাট। এই পাড়েরহাট থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় বিশাল সুন্দরবনের মৎস্য ব্যবসার ৯০ ভাগ। বাণিজ্যিকভাবে অসম্ভব গুরুত্বপুর্ণ বন্দরটি আজ হুমকীর সম্মুখীন। পাড়েরহাট বন্দরে ঢোকার যে চ্যানেলটি রয়েছে তার দুই পাড়েই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে চর। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চ্যানেলটি, এভাবে চলতে থাকলে আগামী ৫ বছরে পাড়েরহাট বন্দরে একটি ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকাও ঢুকবেনা। পাড়েরহাট বন্দরের বিশিষ্ট সৎস্য ব্যবসায়ী মহিউদ্দিন মল্লিক জানান, আগে পাড়েরহাটে বড় বড় স্টিমার ভিড়ত। আজ একটি ছোট মাছ ধরার ট্রলার ভেড়াতে হলেও জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এতে করে এই মৎস্য বন্দরটি মারাত্মকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছে।

কঁচা নদী থেকে যে খালটি দিয়ে বন্দরে ঢুকতে হয় সেই খালটির নাম উমিদপুর খাল। খালের মোহনা পলি জমে ভরাট হয়ে গেছে। স্থানীয় ইউপি মেম্বার সেলিম খান বলেন, শীতকালে এই মোহনা পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। মোহনার দুই পাড়ে দুটি চর এক হয়ে যাচ্ছে। পাড়েরহাট মৎস্যজীবী এসোসিয়েশন এই বন্দরটি ব্যবহারোপযোগী রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মৎস্যজীবি সমিতির সভাপতি মহিউদ্দিন মল্লিক ড্রেজিং এর জন্যে বিভিন্নভাবে তদ্বির করছেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছেনা। এসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্থানে স্থানে বাঁশ পুতে বর্তমানে বন্দরে নেভিগেশনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। নেভিগেশনের সমস্যার কারণে ১৯৮০ সনে পাড়েরহাটের লঞ্চ স্টিমার ঘাটটি উঠে গেছে। এখন লঞ্চ ভীড়ছে নদীর অপর পাড়ে চরখালী গ্রামে। ফলে অবধারিতভাবে সৃষ্টি হচ্ছে যোগাযোগ সংকট। স্থানীয় একজন ব্যবসায়ী জানান পাড়েরহাট বন্দর ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা না হলে একদিকে বন্দরের উপরে নির্ভশীল কয়েকশত ব্যবসায়ী পরিবার বেশ কিছু জেলে পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাবে। তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ হবে দেশের মৎস্য সম্পন্নদ ক্ষেত্র।

চরের চিত্র

পিরোজপুর থেকে বরিশাল

পিরোজপুর জেলার নৌপথে নাব্যতার সমস্যা ও চরের অবস্থান সরেজমিনে দেখার জন্যে হুলার হাট থেকে স্টীমার যোগে বরিশাল যাওয়া হয়। যাত্রাটি রীতিমতভীতিকর। একদিকে দেখা যাবে আদিগন্ত নীরব ভাঙ্গন। অন্যদিকে বিশাল বিস্তৃত চর। কখানো কখানো আশংকায় দম টাটকে আসে এই বুঝি চরের বুকে আটকে গেলে স্টীমার। কোথাও কোথাও দুই পাশ থেকে দুটি চর ক্রমাগম গ্রাস করে নিচ্ছে নদীর জল। প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্য দিয়ে

স্টীমারগুলি চলাচল করছে। যে কোন মুহুর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কাউখালীর পশ্চিমে হুলারহাট বন্দরের পুর্ব এবং উত্তর তীরে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট চর। চর পড়ায় ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে নদীর গতিপথ।

ভান্ডারিয়া নদীর মোহনাতেও সৃষ্টি হয়েছে বিরাট চর। মাঝে মাঝে এ নদীতে লঞ্চ চরে আটকেও যায়। পিরোজপুর সদর উপজেলায় বরিশাল ইউনিয়নের মাঝে তেলীখালী গ্রামের অপর পাড়ে বলেশ্বর নদীতে সৃষ্টি হয়েছে একটি চর। প্রায় এক হাজার একর আয়তনের এর চর সৃষ্ট হওয়ায় লঞ্চ ও স্টীমারের গতিপথ পরিবর্তন করতে হয়েছে। তুষখালী নদীর মোহনায় সৃষ্টি চরের ফলে তুষখালী ঘাটে পৌঁছার জন্য লঞ্চকে জোয়ারের পানির জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।

স্বরূপকাঠি উপজেলার প্রবেশদ্বার নদী মুখেও চর জেগেছে। আর এর ফলে এই বন্দরে লঞ্চ ভিড়তেও সমস্যার মুখে পড়েতে হয়।

স্থানীয় মানুষের মতামত

স্থানীয় কয়েকজন সংবাদকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংগে জেলার নদীভাঙ্গন এবং চর ও নাব্যতা হ্রাস বিষয়ে জানতে চাইলে তারা বলেন এ বিষয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পত্র পত্রিকায় প্রচুর লেখা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষজন বিভিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমুহ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছেন অথচ আজও জেলার নদীভাঙ্গন রোধের, নদীবন্দরগুলিকে রক্ষার এবং নাব্যতা স্বাভাবিক রাখার কোন স্থায়ী এবং কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তারা আরও বলেন, এ বিষয়ে অচিরেই স্থায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ভেঙ্গে পড়বে জেলার যোগাযোগ অবকাঠামো। প্রতিবছরে আরও অধিক হারে মানুষ জমিজমা বাড়ি-ঘর নদীগর্ভে হারিয়ে রিক্ত, নিঃস্ব হবে। ভেঙ্গে পড়বে জেলার শিল্প বাণিজ্য কৃষি ব্যবস্থা। যার অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুল্য অপরিমেয়।

সৌজন্যেঃ ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)